সেলিম রেজা নিউটন

গণবিপ্লব-প্রবাহ
চলমান ইশতেহারের খসড়া

বিপ্লব যারা শুধু বইয়ে পড়েছে, বিপ্লব শুরু হলে তারা তাকে চিনতে পারে না। পূর্বনির্ধারিত কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচির জামা গায়ে আসে না বিপ্লব। মতবাদের বই-পড়া প্রশিক্ষিত মাথা তাই চিনতে পারে না তাকে। বিপ্লব যখন দৃশ্যমান হতে শুরু করে এমনকি তখনও রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের বাইরে সবচে বড়ো রাজনৈতিক দলের সবচে বড়ো কর্তার মনে হতে থাকে এই সবই সরকার-পতনের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত মাত্র।

আরো বড়ো পরিসরে যখন জাগতে লাগে সুস্পষ্ট গণঅভ্যুত্থান, সবচাইতে অগ্রসর তরুণ-যুবারা যেদিন মধ্যরাতে সবচে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাগত বাঁকটা নেয় একনায়কের বহুকালের বিশেষ্য, বিশেষণ, ন্যারেটিভ ও বাগধারাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসার মধ্য দিয়ে, তার আগের দিন সকালেও পঁচিশ বছর ধরে গণঅভ্যুত্থানের মুখস্থ গাইডবই লিখতে থাকা, দরবেশের আলখাল্লা পরা, সবচে বড়ো স্বঘোষিত বিপ্লবী দার্শনিকের মনে হতে থাকে, “তরুণরা বিদ্যমান দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার ফ্যাসিস্ট শক্তি ও কাঠামো … টিকিয়ে রাখতে চায়। বিদ্যমান ব্যবস্থাটা বজায় রেখে নিজেরা দুর্নীতিবাজ আমলা, পুলিশ ইত্যাদি হতে চায়, রাষ্ট্রের চাকরি চায়।” তার ব্যক্তিগত বহুরূপী কাল্টের সদস্যদেরকে এই বলে সতর্ক করতে থাকে সে, “নৈতিকতার দিক থেকে ভাবুন, তরুণরা দুর্নীতিবাজ হতে চায়—এটাই তাদের বাসনা।” আর একটু পরেই দশক-জোড়া একনায়কতন্ত্রের গোড়া উপরে ফেলে দেবে যারা, সেই তরুণ শিক্ষার্থীদের মুক্তিপিপাসু লড়াই সম্পর্কে মহা-আত্মবিশ্বাসের সাথে এই কটাক্ষ করতে তার বাধে না:

"আমরা কতো বড় গর্তে পড়ে গিয়েছি একটু ভাবেন। এটাই তো সরকারি আমলা হয়ে দুর্নীতি করা ও সহজে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার খায়েশ ও জীবন পণ আকাঙ্ক্ষা? এটা দেখে যারপর নাই মোহিত না হয়ে উপায় নাই।" এতখানি মোহিত হওয়ার পরেও আফসোসের সীমা থাকে না তার: "পৃথিবীর কোথাও অন্য কোন ইতিহাসে তারুণ্যের বিপুল অপচয়ের এই বিশাল নজির আপনি পাবেন না।"[১]

তরুণ শিক্ষার্থীদের গণঅভ্যুত্থান-প্রবাহ যখন তার অপ্রতিরোধ্যতার অভিমুখ সুনিশ্চিত করে তুলেছে, যখন তিন দিনে ৮৩ জনকে খুন করে ফেলেছে রক্তপিপাসু রাষ্ট্রীয় বন্দুকধারী বাহিনী, তখনও একচেটিয়া একনায়কের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় আসে না যে, আর মাত্র ১৫ দিনের মাথায় তাকে কোনোমতে জান নিয়ে পালাতে হবে লেজ তুলে প্রতিবেশী পরাশক্তির কোলে। ব্যাগখানা গোছানোরও ভালো করে সময় পাবেন না। অতঃপর তার পলায়নপর হেলিকপ্টার উড্ডয়নের মাত্র দেড়-দুই ঘণ্টা আগেও তার মাতৃসমা ভারতমাতার একেবারে 'র' ইন্টেলিজেন্স বাহিনীটি টেরটি পাবে না যে, এতকাল তাদের মদদে টিকে থাকা মানুষখেকো মহিলাটির ব্যক্তিগত ভরণপোষণের দায়দায়িত্বও এবার নিতে হবে তাদেরই। ভবিষ্যতে শুধু এই সান্ত্বনাটুকু তারা পেতে পারবে যে, তাদের চীন-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীরাও একই রকম অন্ধকারে ছিল।

অথরিটারিয়ান ইন্টেলিজেন্স কোনোদিন গণবিদ্রোহ-গণবিপ্লব আন্দাজ পায় না। স্বতঃস্ফূর্ত গণবিপ্লবও কোনোদিন সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে হাঁটে না। বিপ্লবের প্রধান একটা শনাক্তকরণ চিহ্নই হচ্ছে, ঘটমান বর্তমানে তাকে চেনা যায় না। পণ্ডিতেরা প্রশ্ন তোলে: ইহা কি বিপ্লব বটে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে এরকম তো লেখা নাই বাছা! কই, মার্কস কিম্বা লেনিন বা খোমেনী তো এরকম বলেন নি! বিপ্লবী হুজুরেরা বারবার বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী পার্টি হয় না; বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হয় না। এটা যদি বিপ্লবই হয়

[১] ফরহাদ মজহার, ফেসবুক, ১৪ই জুলাই ২০২৪, সকাল ৯:৩৯। https://archive.ph/oArCN।

তবে এই বিপ্লবের লেনিনটা কে? কেইবা এই বিপ্লবের খোমেনি?

অথেনটিক বৈপ্লবিক বার্থ সার্টিফিকেট ছাড়া জলজ্যান্ত বিপ্লবকে শনাক্ত করতে তারা পারে না কখনো। বড়ো জোর 'গণঅভ্যুত্থান'— বলে বড়ো একটা দম ফেলে হাঁসফাঁস করে যত সমাজবৈজ্ঞানিক বুকিশের দল। নিজের ঘাড়ের উপরে মাথার বদলে কিছু বই নিয়ে ঘোরে এই পণ্ডিতের পাল। জলজ্যান্ত বিপ্লবের জন্মসনদ নিয়ে গোলমাল লাগে ইনাদের। বই ছাড়া, থিওরি ছাড়া, দার্শনিকের নাম ছাড়া, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের পবিত্র গ্রন্থ ছাড়া নিছক নিজের চোখে, সাদা চোখে, দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে, জেনে-বুঝে-উপলব্ধি করে পাঁচটা কথা বলতে পারে না সর্বপ্রকার সর্বধারার লালনীল মতাদর্শের পন্ডিতসমাজ। তারা বলছে বড়ো জোর গণঅভ্যুত্থান। একই জিনিসের আলাদা আলাদা একত্রিশটা খুপরির ক্যাটেগরি বানাতে না পারা পর্যন্ত তাদের তত্ত্বমাথা শান্তি পায় না।

অথচ ঘটনা হলো, যাহা গণঅভ্যুত্থান তাহাই বিপ্লব। বিপ্লবের দুইখানা অতিরিক্ত শৃঙ্গ থাকে না। সরল শব্দার্থকোষের সরল বিবরণী মোতাবেক, "যে সুস্থিত সত্তা উপরিস্থ থাকিয়া অভিভাবকের ন্যায় সক্রিয় হয়", তাকে বলে "অভি"। অভির উত্থানকেই "অভ্যুত্থান" বলে। আর যখন খোদ জনগণ রাষ্ট্রীয় মুরুব্বিদেরও উপরে স্থাপন করে নিজেদের সামাজিক সত্তাকে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাকে বলে "গণঅভ্যুত্থান"। এই সেই সময় যখন বান ডাকে। ভেসে যায় পুরাতন। গান ডাকেঃ "শুকনো গাঙে আসুক জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক"। ভাঙনের জয়গান শুরু হয়ে যায়। প্লাবন আসে দেশজুড়ে, স্থানজুড়ে, রাষ্ট্রজুড়ে। মহাপ্লাবন। জনপ্লাবন। কারো পক্ষে নিজেকে আর ছোটো করে দেখার উপায় থাকে না। কারো পক্ষে নিজেকে আর বড়ো করে দেখার উপায় থাকে না। প্লাবন এমন এক প্রাকৃতিক পূর্বশর্ত যা না ঘটলে নতুন পলি পড়ে না। নতুন জমি জাগে না। নতুন বিনির্মাণ শুরু করা যায় না। নতুন সমাজের পত্তন ঘটানোর কাজে সূত্রপাত ঘটানো যায় না। তখনই এই মর্মে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায় যে, বিপ্লব ঘটেছে। বিপ্লবে 'প্লব'

থাকে। প্লবই প্লাবন। প্লাবনে সকলে ভাসে। প্লাবনে সকলই ভাসে। ভেসে যায় পুরাতন মসনদ, একনায়কতন্ত্রের যাবতীয় আইকন-চিহ্ন-প্রতিমা। বৈপ্লবিক বানে ভাসে এমনকি বিপ্লবের মুখস্থ, পুরাতন, বস্তাপচা লাল বই, নীল নকশা, সবুজ বিধান।

বিপ্লব ছক কষে ঘটে না কখনো। বিপ্লব বুরোক্র্যাসি নয়। গণঅভ্যুত্থান তাই আমলাতান্ত্রিক কোনো কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং দিয়ে হয় না। মজলিশে শুরা কিম্বা বৈপ্লবিক পলিটবুরোর ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত কর্মসূচি ফলো করে বিপ্লব হয় না। স্ট্র্যাটেজি ও পূর্বপরিকল্পনা থাকে গুটিকয়ের অভ্যুত্থানে। রাজনৈতিক দলের বা সামরিক সংস্থার বন্দুকীয় অভ্যুত্থানে। অভ্যুত্থানে থাকে বিপ্লবী তত্ত্বের বই, আর সহি মতাদর্শ, আর আগে থেকে ঠিক করা রণকৌশল। বিপ্লব বুরোক্র্যাটিক নয়। রাষ্ট্রের, আদালতের, সেনাবাহিনীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরিবর্তনকামী পত্রিকার, এমনকি পেশাদার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পার্টিগুলোরও ফরমাল হায়ারার্কি থাকে। কিন্তু বিপ্লবপ্রবাহে কোনো উচ্চনিচতন্ত্র থাকে না। থাকে বন্ধুত্বের অর্গানিক নেটওয়ার্ক। ব্যথিতদের বেদনার আনুভূমিক গঠনকাঠামো। বিপ্লব চিরকালই স্বতঃস্ফূর্ত আর গণ। বিপ্লব মানেই স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব। বিপ্লব মানেই গণবিপ্লব। আকাশ থেকে বিনামেঘে বাজ পড়ার মতো নেমে আসে বিপ্লব[২]। সব তত্ত্ব চমকে যায়। শেখানো বিপ্লববুদ্ধি লোপ পায়। থ মারে থতমত বিদ্বৎসমাজ।

রাজতন্ত্র এবং জমিদারির হাজার হাজার বছরে আমাদের কোষে কোষে জমে আছে চিন্তাদাসত্ব। কর্তাপ্রথার বীজ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাম্রাজ্যের, রাষ্ট্রের, সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণতা হয়ত বা সহজেই শনাক্ত করা যায়, কিন্তু যেটা সনাতন বিপ্লবীরাও সহজে দেখে না তা হলো, "বিবাহে – পরিবারেও

---

[২] "মন খুলে, সানন্দে, কবুল করেছিলেন সোশ্যালিস্ট রেভলুশানারি পার্টির সভাপতি জেনজিনোভ যে, "আকাশ থেকে বাজ পড়ার মতো নেমে এসেছিল বিপ্লব। শোনেন, স্রেফ খোলামেলা কথা বলি চলেন, বিপ্লব এসেছিল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। আমরা যারা বিপ্লবীরা বছরের পর বছর ধরে এর জন্য কাজ করেছি আর সবসময়ই অপেক্ষা করেছি এরই জন্য, সেই আমাদেরও প্রত্যাশার বাইরে ছিল তা। (Trotsky, 2008: 105) [নিউটন, ভবিষ্যতের সরকার]

– মতাদর্শ রয়েছে দেদার”[৩]। বিপ্লবী ব্যক্তিরও আত্মা ও ঘরের ভেতরে থাকে কর্তৃত্বপরায়ণতার ভূত। জ্ঞানীদের বই ছাড়া, বিপ্লবীদের তত্ত্বগ্রন্থ ছাড়া দিশা পায় না আমাদের মাথা। আমাদের এই চিন্তাদাসত্বের প্রণালীর ভেতরেই আছে কর্তাপ্রথার বীজ। পিতৃতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তাপ্রণালী তাই পিতা খোঁজে। নেতা খোঁজে। আগে থেকে নির্ধারিত বিশুদ্ধ বৈপ্লবিক তত্ত্ব খোঁজে। উনবিংশ শতকের কর্তৃত্বপরায়ণ বিপ্লবীরা বলে বেড়ায়, “বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী পার্টি হয় না, আর বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হয় না”। মুখে তারা বলে ঠিকই, জনতার জন্য বিপ্লব, কিন্তু জনতার হাতে ছাড়া বিপ্লবকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। জনতার পক্ষ থেকে জনতার অভিভাবক হয়ে উঠতে চায়। তারা ভাবে জনতার জ্ঞান নাই, বিপ্লবী বিজ্ঞান নাই। জনতার কাজ শুধু জিন্দাবাদ বলা, আর বিপ্লবী নেতাদের পেছনে পেছনে হাঁটা। কামলা খাটা। বিপ্লব, তারা ভাবে, বিপ্লবী আমলাদের কাজ। অথচ চিরটা কাল ইতিহাস দেখিয়েছে, আড়ালে বন্দুক নিয়ে, পেছনে লোক জুটিয়ে মহামতি ধুরন্ধর নেতা আর রাজনৈতিক দল মিলে ক্ষমতা দখল করা অভ্যুত্থান এক জিনিস, বিপ্লব অন্য জিনিস। এক কিম্বা একাধিক আমলাতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে, স্বঘোষিত বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে যত বিপ্লবের গল্প শোনা যায়, সেগুলো অভ্যুত্থান মাত্র। ছলে-বলে-কৌশলে সামরিক অভ্যুত্থান। ক্ষমতার বদল মাত্র। কখনও মানুষ তাতে খুশি হতে পারে কিন্তু অংশগ্রহণ করে না। এরকম অভ্যুত্থানে কয়েক শত কিম্বা কয়েক হাজার সমর্থকের সোচ্চার উল্লাসের আলোকিত্রকে ‘গণঅভ্যুত্থান’ বলে চালানোটা ইতিহাস-গ্রন্থেই চলে কিন্তু ও জিনিস বিপ্লবে চলে না। “ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই হলো বিপ্লবের সবচাইতে সন্দেহাতীত বৈশিষ্ট্য। ... বিপ্লবের ইতিহাসের প্রথম কথাটাই হলো ... শাসকতার জগতে জনসাধারণের প্রবল প্রবেশ।” (Trotsky, 2008: xv)

তিন শ বছর ধরে রাশিয়া শাসন করা জারতন্ত্রের যেদিন পতন ঘটে,

---

[৩] নিউটন, ২০১১; “যুদ্ধ নয়, নৈরাজ্যই নিয়ম”, *জেন-যৌনতার ফাঁকে ফাঁকে* [প্রকাশিতব্য]।

মুখস্থ মতাদর্শের ট্রেনিংপ্রাপ্ত পেশাদার বিপ্লবীরা টাশকি খেয়ে যায়। সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবে সবচেয়ে সামনের সারিতে থাকে তরুণ-যুবক আর সাধারণ মেহনতি মানুষ। আগামাথা না বুঝে নেতারা দৌড়ায় পিছে পিছে। তাদের পেছনে থাকে পুরাতনী রাজনৈতিক দল। আর সবার পেছনে থাকে কনফিউশনে ভুগতে থাকা বস্তাপচা বুদ্ধিজীবীর পাল। উদ্ভ্রান্তের মতো বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে। তাদের কথায় কান না দিয়ে সমস্ত কিছুকে পর্যালোচনার অধীনে আনে বিপ্লব।

তারই মধ্যে এসে পড়ে প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল, পঞ্চমবাহিনীর সোচ্চার ও সক্রিয় উপস্থিতির চিহ্ন। তারা শুধু দোষ ধরে। ঐ যে মূর্তি ভাঙল! তারা শুধু খুঁত বের করে। ঐ যে দ্যাখো, এই গণঅভ্যুত্থানপ্রবাহে শত শত তাজা প্রাণ হত্যায় চুপচাপ সমর্থন করেছিল যারা সেই চিরবেঈমান, চিরদুঃখিতরা আজ দ্যাখো বাধা পাচ্ছে পুরাকালে তাদের শোকপ্রকাশে। তারা খুব চিল্লিয়ে হেঁয়ালি রচনা করে বলতে থাকে, আমাদের বাকস্বাধীনতা নাই! দুষ্কৃতিরা আমাদের টাইমলাইন চেক করছে! প্রাক্তন একনায়কের প্রতি আমাদের পক্ষপাত গোপন থাকছে না! আমাদের প্রাইভেসি নাই! এরই কি নাম বিপ্লব! এই জন্যই কি আমরা বিপ্লব করেছিলাম! এরই জন্য কি এত এত শহীদের আত্মদান! পঞ্চমবাহিনীকে দেখে মনে হয়, বিভ্রান্তি ছড়ানোর অধিকারই বিপ্লব।

বিপ্লবের, অর্থাৎ গণবিপ্লবের, এই এক প্রধান চিহ্ন বটে। এতকাল কথা বলতে হতো ভানভনিতায়, ঠারেঠুরে, অভিনয় করে, সান্ধ্যভাষায়। রাজনৈতিকভাবে মূক ও বধির হয়ে পড়েছিল বাক্যসমাজ। সর্বশেষ মেঘ ছিল সর্বাত্মক সরকারি ইন্টারনেট শাটডাউন। বিপ্লব রাতারাতি জাদু দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে গোটা জরামরা নেক্রোপলিস এই সমাজের আপামর মানুষকে। মানুষের মুখে আজ কথার ফুলঝুরি। যেন বা নতুন সব সদ্যোজাত শিশুরা আধো আধো বাক্য শিখছে। যা খুশি তাই বলছে। এমনকি ধ্বনি শুধু, অর্থ কিছু না থাকলেও চলে। এই যে এত মানুষ কথা বলছে, শত

কথা, এমনকি দুই দিন আগের শাসকদের ছদ্মবেশী সমর্থক, ছুপালীগও করে যাচ্ছে কত কত কলকল, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আতঙ্ক অস্থিরতা পৌঁছাচ্ছে আকাশ-অব্দি, প্রশ্ন তুলছে নিজেদের বাক- আর শোক-স্বাধীনতার – তাতেই প্রমাণ মিলছে, প্রকৃতই বিপ্লব ঘটেছে। সত্যি সত্যি শতফুল ফুটছে। বিকশিত হচ্ছে শত মত। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এই বিপ্লব পর্যাপ্ত গণতান্ত্রিক বটে। বহুস্বর বহুমত বহুকেন্দ্র এই বিপ্লবের গড়নেই ছিল।

বিপ্লব অত ছিমছাম হয় না। ক্যাওস, বিশৃঙ্খলা, হাজার রকমের কথা, আর অজস্র মতামত বিপ্লবের সাধারণ লক্ষণ। যে কখনো কথা বলে নি সেও আজ কথা বলছে। যে কখনো রাষ্ট্রের পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে মতামত দেয় সেও বলছে কী করা উচিত, আর কী করা ঠিক না। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস, আর কুজ্ঝটিকা-কুহেলিকা বিপ্লবের বিশেষ আবহাওয়া। পুরাতন সমস্ত শাসনচিহ্নের প্রতি আউলাঝাউলা গণক্রোধ বিপ্লবের প্রাথমিক ঝাপট। থানা ফেলে, বন্দুক ফেলে আস্ত একটা পুলিশবাহিনীর আত্মগোপন, তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিনের সরকারহীনতা এই জায়মান বৈপ্লবিক সমাজের স্বরাজের সম্ভাব্যতার অসামান্য সাক্ষর। সমাজের আত্মপরিচালনাগত সক্ষমতা জেগে উঠছে পূর্ণ উৎসাহে। নেটজুড়ে, পাড়ায় পাড়ায়, মোড়ে মোড়ে আপামর মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক মেলামেশা, লেনদেন, সংগঠন জেগে উঠছে প্রবল উৎসাহে। প্রত্যেকেই ভাবছে আজ এদেশ আমারও। আমি দেশ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে, আইন ও সংবিধান নিয়ে লিখতে পারি, বলতে পারি, পাঠচক্র করতে পারি। কর্তব্য আমারও। এতকিছুর পরও আগাগোড়া নারীদের প্রবল উপস্থিতি বিপ্লবের বিশেষ চিহ্ন। অরাজকতা বিপ্লবের অংশ চিরকাল। ফরাসি বিপ্লবেও ছিল। গণবিপ্লবের এই অরাজ অর্গানিক। সর্বপ্রকার ক্যাওস ও গণ্ডগোল পার হয়ে এগোয় বিপ্লব। নিন্দুকের মনে দুঃখ দিয়ে প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে এগোয় বিপ্লব।

দুই॥

মুক্তি সবাই চান কিন্তু মুক্তি এসে হাজির হলে ভয় পান অনেকে। কেননা মুক্তির সব দায়দায়িত্ব নিতে হয় মুক্ত মানুষকে নিজেকেই। বাকিরা দোষারোপ করেন। বোঝাতে চান, শৃঙ্খলেই মঙ্গল। যেন স্বৈরতন্ত্রের শৃংখলই ভালো ছিল– আমরা মুক্তির উপযুক্ত নই। এইসব দোষারোপকারী দালালদের যুক্তির শেষ নাই, বিদ্যাবুদ্ধির অন্ত নাই।

চলমান গণবিপ্লবকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে প্রথমে আসলো মন্দিরে-বাড়িঘরে হামলা। পেছনের পেছনে এলো কত যে নালিশ। এলো গুজব। এলো উদ্বেগ। এলো আতঙ্ক। দুশ্চিন্তা, হাহাকার, আহাজারি। যেন গণতন্ত্রের জন্য গণঅভ্যুত্থান করাটা অপরাধ হয়ে গেছে। আরো আসলো হাসিনার ঘাপটি মারা দালাল যত সব। হিন্দুদের জন্য তাদের মায়াকান্নার শেষ নাই। অথচ এই গত পূজার সময়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা শ্রদ্ধেয় রানা দাশ গুপ্ত আঙুল তুলেছিলেন হাসিনা সরকারের দিকেই। কে না জানে, গত ১৬ বছর হিন্দুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার রাজনীতি করেছে আওয়ামী লীগ। ৭২ থেকে ৭৫ সময়পর্বে "অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন" প্রণয়ন করেছিল তারাই। সেই আইনের ছত্রছায়ায় কেড়ে নিয়েছিল হাজার হাজার হিন্দুর জমি। তারপর আসলো ডাকাতি। ডাকাতির অজস্র গুজব। ডাকাত লীগে ভরে গেল যেন দেশ। আরো যে কত কিছু আসবে। উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় দেখানো। কিন্তু মানুষ ভয় পাচ্ছেন না। বিপ্লব তৈরি করে নিচ্ছে সবাইকে।

এটা আপনাদের চিরমুখস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লব না। এটা কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চে গুয়েভারার সামরিক বিপ্লব না। এটা ইরানের ইসলামী বিপ্লব না। এটা উনবিংশ শতাব্দীর অ্যানালগ-আমলাতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। ফলে কেউ একে চিনতে পারছেন না। উনিশ শতকের জ্ঞান-বুদ্ধি-তত্ত্ব দিয়ে আপনি এই চলমান গণবিপ্লব-প্রবাহের প্রকৃত পরিচয়ের কুল পাবেন না। ফলে, বস্তাপচা বাতিল বুদ্ধিজীবীরা আহাজারি করেই চলেছেন। অন্ধের হস্তিদর্শন অন্তহীন।

আর তরুণেরা নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বিপ্লবের। এই বিপ্লব ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কসমূহের মতো। নেটওয়ার্কগুলো স্বাধীন, উন্মুক্ত, বিকেন্দ্রীভূত, গণতান্ত্রিক, বহু কণ্ঠের এবং সহযোগিতামূলক। আবার, ইন্টারনেটই এই আন্দোলনের হৃৎপিণ্ড, রক্তচলাচল তন্ত্র, এবং স্নায়ুতন্ত্র। মহাসাগরের মতো এই বিপ্লব একক কোনো কেন্দ্রহীন। এটা পরিচালিত হচ্ছে, ক্রমশ বেড়ে উঠছে, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক একটা নেটওয়ার্কের নেতৃত্বে। নেটওয়ার্ক হচ্ছে ইন্টারনেটের সংগঠন। নেটওয়ার্ক হচ্ছে সমাজের আদিতম ইনবিল্ট প্রতিষ্ঠান, ডিফল্ট সংগঠন। নেটওয়ার্ক হচ্ছে দেহ-কোষ-শরীরের সহজাত সংগঠনপ্রণালী। নেটওয়ার্ক মানে কানেকশন। মানবীয় যুক্ততা। প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎপ্রবাহ। নেটওয়ার্ক বলতে বোঝায় প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মুক্ত এবং স্বাধীন যোগাযোগ-বিন্যাস। প্রতিটা নেটওয়ার্কের প্রতিটা নোড মুক্ত, স্বাধীন, স্বপরিচালিত। এ হলো পেশাভিত্তিক, পাড়ামহল্লাভিত্তিক, আগ্রহভিত্তিক, কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক, বিভিন্ন সৃজনশীল সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতাকেন্দ্রিক কোটি কোটি নেটওয়ার্কের একটা মহা সামাজিক-রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক। এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত, স্ব-পরিচালিত, বহু স্বরের, বহু রঙের, বিকেন্দ্রীভূত, আনুভূমিক, ছাত্র-গণআন্দোলনের ধারাবাহিক যোগাযোগ-প্রবাহ। এই ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানপ্রবাহ আসলে মুক্ত নেটওয়ার্কসমূহের একটা নেটওয়ার্ক । নতুন রাষ্ট্রের প্রাথমিক বিন্যাসও রচিত হোক আন্দোলনের এবং ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কসমূহের নিজস্ব বিন্যাসে। এটা মূলগতভাবে আমলাতান্ত্রিক হওয়া চলবে না। এটা উঁচু-নিচু কর্তৃত্বতন্ত্র মার্কা জিনিস হলে চলবে না।

এই বিপ্লব মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলা শত শত তাজা মানুষের জীবনের মূল্যে কেনা সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত একটা গণবিপ্লব। এই জিনিস সস্তা না। এই জিনিস প্রতিদিন আসে না। এ যখন আসে, সবকিছুকে ঠেলে নিয়ে যায়। সবকিছু দৌড়ায় সামনের দিকে। মুক্তির দিকে। অসম্ভব দ্রুতগামী এক ঝড়ের গতিতে পূর্ণতর বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। আক্ষরিক অর্থেই অজস্র মানুষের বিপ্লব। প্রত্যক্ষভাবে

যারা এই বিপ্লবের কাজে নেমে পড়েছেন তারা নিজেরাও কতটা খেয়াল করছেন তা আমি জানি না, কিন্তু বাংলাদেশ একটা দীর্ঘস্থায়ী গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে তুমুল বেগে অগ্রসর হচ্ছে মহাবিপ্লবের দিকে। এই বিপ্লব-প্রবাহ কোথায় গিয়ে থামবে কেউ বলতে পারে না। বলা যায় না, গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে বদলে দেবে বাংলাদেশের বিপ্লব-প্রবাহ।

অকল্পনীয় দ্রুততর লয়ে সময়, সমাজ এবং মানুষকে তৈরি করে নিতে নিতে এগিয়ে চলেছে এই গণবিপ্লব। আপনাআপনি তৈরি হচ্ছে সব। পাহারা বসছে গণমানুষের। ডাকাতির বিরুদ্ধে পাহারা। মন্দিরে-বাড়িঘরে পাহারা। গুজবের বিরুদ্ধে, ভয়ের বিরুদ্ধে, আতঙ্কের বিরুদ্ধে পাহারা। সারা বাংলাদেশ রাত জাগছে। মানুষ সংগঠিত হচ্ছেন। জেগে উঠছে গোটা সমাজ– একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাপটে যা উবে যেতে বসেছিল। যে দুই তরুণ রাগ করে কথা বলতেন না অনেক দিন, তাঁরা এখন হাতে হাত রেখে রাস্তা সামলাচ্ছেন সারাদিন। ছোটো ছোটো বিভেদগুলো মুছে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত দুঃখ এবং অপার হতাশা ঠাঁই পাচ্ছে না আর মনে। সক্রিয় হয়ে উঠছেন প্রত্যেকেই। চিন্তায়, কথায়, তৎপরতায় প্রত্যেককে তৈরি করে তুলছে বিপ্লব। কাউকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেবে না সে। আপনি টেরও পাচ্ছেন না, অথচ আপনিও তৈরি হয়ে উঠছেন আরো বড়ো ঢেউয়ের জন্য।

মনোযোগ দিন। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিজের নিজের মতো করে স্থানীয়ভাবে পাড়ায়-মহল্লায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। এই বিপ্লব আপনারও। এটা আসলে বহু বহু ছোটো ছোটো বিপ্লব ও অভ্যুত্থানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ধাপে ধাপে সে নিজেকে ক্রমশ প্রকাশ করে চলেছে। আগের ধাপেও কেউ জানে না পরের ধাপে কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে বাংলাদেশের গণসমাজ। প্রতিমুহূর্তে চলমান এবং পরিবর্তমান পরিস্থিতিসমূহের পরবর্তী গতিপ্রবাহ সত্যি সত্যি কোন কোন বাঁক ঘুরে কোন দিকে অগ্রসর হবে তা ঠিকঠাক মতো অনুমান করতে পারাটা মোটেই সহজ কোনো কাজ নয়। একটা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ

বিনির্মাণে বর্তমান গণঅভ্যুত্থান প্রবাহ সম্ভবত বাংলাদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্রের আমূল বৈপ্লবিক সংস্কার সম্পন্ন করতে চলেছে। এখনই প্রশ্ন তুলুনঃ স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কোন পথে হবে।

এনালাইটিক্যাল কম্পাস হিসেবে কাজ করতে পারাটা আমাদের জন্য জরুরি। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা, অনুমান করা, সেগুলো প্রকাশ করা, আন্দোলন-প্রবাহের গতিবিধি বিশ্লেষণ করা, লেখা, সবার সামনে বিভিন্ন বিকল্প তুলে ধরা, পরমতসহিষ্ণু এবং বহুমতনির্ভর সমাজের কথা তুলে ধরা— এগুলো আমাদের জরুরি কাজ।

এই বিপ্লব চলমান। তৈরি হোন দীর্ঘমেয়াদী এই বিপ্লব-প্রবাহের জন্য। দেশ যেমন কারুর বাপের না, স্বতঃস্ফূর্ত এই গণবিপ্লবও কারো বাপের না। এই বিপ্লব আপনার। আপনি এতে অংশগ্রহণ করুন। তাহলে পেছনে আর ফিরবে না বাংলাদেশ। এই বিপ্লব দূরগামী, দীর্ঘমেয়াদী। আমাদেরকে ভবিষ্যৎ দেখতে পারতে হবে এবং মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে আসন্ন ইতিহাসের নির্মীয়মান ছবি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ জুলাই-আগস্ট ২০২৪
প্রুফ দেখা হয় নি। পুরোটা একবার রিডিং দিতে পারি নি।

হদিস

Trotsky, Leon (2008). *History of the Russian Revolution.* Unabridged. Translated by Max Eastman. Chicago, Illinois: Haymarket Books.